লেখকের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহ্য

সূচি

গল্প লেখার গল্প ৭
কেন লিখি ১৩
সাহিত্য করার আগে ১৫
লেখকের সমস্যা ২৬
প্রতিভা ৩৪
নিজের কথা ৩৯
উপন্যাসের ধারা ৪১
নতুন জীবন ৪৭
প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র ৫০
সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ ৫৩
“বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক” ৬২
সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি ৬৫
ভারতের মর্মবাণী ৬৬
‘পাঠকগোষ্ঠী’র আলোচনা ৭০
প্রগতি সাহিত্য ৭৭
বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা ৮৪

গল্প লেখার গল্প

বাংলা তেরোশ পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি। বিএসসি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মতো এমন আর কি আছে? এত জটিলতায় এমন চুলচেরা নিয়ম! রসায়ন ও ও পদার্থবিদ্যা তো অভিনব কাব্য—ছ্যাবলাবি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।

ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, ল্যাবরেটরিতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি: নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়! হাজার নতুন প্রশ্নের ভাবে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাক—যতক্ষণ সেটিকে তুলো ধুনো করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পরিণত করার মতো পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই। ক্লাস এগিয়ে যায় বহুদূর, আমি মেতে থাকি দু'মাস আগে পড়ানো বিদ্যুতের এক অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে। স্বভাব আজও আমার যায়নি। একটু যা পড়ি আর একটু যা শুনি তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সময় যায়—রাশি রাশি পড়া আর শোনার রীতিমাফিক পড়াশোনা হয়ে ওঠে না।

জ্ঞান সমুদ্রের তীরে একটি উপলখণ্ড কুড়িয়েই গিলে ফেলে আরেকটির দিকে হাত বাড়াতে পারি না—গেলার আগে পরে অনেক রকম প্রক্রিয়া করতে হয়। পাথর হজম করা তো সহজ নয়!

বিজ্ঞান প্রায় সুয়োরাণী হয়ে বসেছিল আমার উপর, শুধু আমার এই স্বভাবের জন্যে আমাকে আয়ত্ত করে উঠতে পারলো না। বৈজ্ঞানিক হতে পারলাম না, পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়াও ঘটে উঠলো না—জীবনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হলো উপন্যাস লিখে।

তখন লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল না–বিজ্ঞানের প্রেমে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি। লিখতে শিখে লেখক হবার সাধ কবে জেগেছিল মনে নেই—বোধ হয় ছেলেবেলাতেই, লুকিয়ে লুকিয়ে যখন নিষিদ্ধ বই পড়তাম, তখন। বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে। আর সে কি পড়া! এরকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিনচার দিন মাঠে ঘাটে, গাছে গাছে, নৌকায় নৌকায়, হাটবাজারে মেলায় ঘুরে আর হৈ চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হতো বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর। হয়তো সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ।

লেখক হবার ইচ্ছে সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইনি। স্কুল জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছেটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে হাত মেলেছিল বহু দূরের ভবিষ্যতে—সঙ্গে সঙ্গে লেখবার তাগিদ যোগায়নি। অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতেলেখা মাসিকপত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুলে আর মফস্বল ও কলকাতায় গোটা তিনেক কলেজে আমি পড়েছি। লিখবো? —এই বয়স আমার! বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা কিছু আমার নেই। কোন্ ভরসায় আমি লিখবো? লেখা তো ছিনিমিনি খেলা নয়! বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখনো করিনি। আমার অধিকার নেই বলে।

১৩৩৫ সালেও,—যে বছর আমি প্রথম লেখা লিখি, —আমার এ মনোভাব বদলায়নি। বরং আরও স্পষ্ট একটা পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সে লিখবো। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্য চর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলি ঠিক করে ফেলবো।

হ্যাঁ, তখন আমার বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে। তবে একথা সত্য যে, কেউ একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক হতে চাইলে তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বা সাহিত্য কোনোটারই বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু একথাও সত্য যে, এযুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরানো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন—তাঁর আবিষ্কারকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এযুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।

স্বীকার করছি, ১৩৩৫ সালে এসব তত্ত্বকথা মানতাম না—অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রেমের সঙ্গেই দৃঢ়তর হতো লেখার সংকল্প। কলেজ থেকে তখনকার বালিকা-বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোনো একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসতো নিজের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসতো স্টেশনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা, ভেসে আসতো কলেজে সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসতো খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম-চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হতো ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিতো, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মতো, কোনোদিন উঠতো চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষা ভূষো—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।

আমি কি জানি ভাষা দিতে?

একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে—সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুমদাম চীনা পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকলো মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও উদাসীনতায়।

নাম করা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়—ব্যস্। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।

একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিত একটা গাল দিলো—কলেজের ছেলেরা যা দেয়। সম্পাদকদের না হোক অন্যদের আমিও যে ধরনের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়েসে দিয়েছি।

তর্কে আমার চিরদিনের বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হলো।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছো? ভালো লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলি তো পড়ো, মাসে ক'টা ভালো গল্প বেরোয় দেখেছো? সম্পাদকেরা কি পাগল যে, ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভালো দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয় ।'

খানিক তর্কের পর প্রশ্ন হলো: 'তুমি কি করে জানলে, প্রবোধ?'

প্রবোধ? প্রবোধ আবার কে? পুরানো দিনের কথা বলার কি বিপদ! এখানে আবার বলে নিতে হবে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল, অফিসিয়াল নাম ছিল শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক নামে তাকে ডাকতো শুধু বাড়ির লোক । ডাকনামের কাছে কি করে আসল নাম হার মানলো পরে বলছি ।

প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, তাই তো! সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়, সেটা তো প্রমাণ নয়! কোনোদিন মাসিক বা মাসিকের সম্পাদকের ত্রিসীমানায় যাইনি– কি করে এদের বোঝাবো যে, সম্পাদকেরা ভালো গল্প পেলেই আদর করে ছাপান —এমনকি চলনসই গল্প পর্যন্ত! বললাম, 'আমি জানি ।' অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হলো । কি বাজি রাখা হয়েছিল বলবো না— আপনারা হয়তো ভাববেন কলেজে পড়বার সময় ছেলেগুলো এমন বখাটে হয়!

বাজি হলো এই । আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেবো । যদি না পারি—সে কথা আর কেন?

আমি জানতাম পারবো । কোনোদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প তো পড়েছি অজস্র । সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভোলানো গল্প নিশ্চয় হবে । আমি কেন, যে-কেউ চেষ্টা করলেই এরকম গল্প লিখতে পারে ।

ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখবো! প্রেমের গল্প? হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লিখতে হবে । বাংলা মাসিকের প্রায় সব গল্পই এরকম প্রেম নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয় । একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদের প্রেম হলো, বিয়েতে বাধা পড়লো, বাধা কেটে মিলন হলো, এই রকম একটা গল্প লিখবো ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে! মন সায় দিল না । মন বললো, প্রেমের গল্প লিখতে চাও লেখো, কিন্তু পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামির গল্প লিখো না—বাংলার ছেলেমেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এরকম গল্প পড়ে পড়ে ।

আবার বললো মন, কেন, প্রেম কি তুমি দেখোনি সংসারে? এত মেলামেশা করলে মানুষের সঙ্গে? যে প্রেম বাস্তব জগতে দেখেছো—তাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে স্বপ্ন জগতের প্রেম করে দাও । তাও ভালো হবে ন্যাকামির চেয়ে ।

তখন মনে পড়লো পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হতো—গিয়েও খুশি হলে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্রাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসী মামী'। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন ভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেবো না। পরে যখন নিজের নামে ভালো লেখা লিখবো, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে নাম দিলাম ডাক নাম— মানিক। কল্পনাশক্তি একটা ভালো ছদ্মনামও খুঁজে পেলো না!

বাংলা মাসের মাঝামাঝি। *বিচিত্রা* আপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। তিনি তখন *বিচিত্রায়* ছিলেন। অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি— পরিচয় হয় পরে।

তারপর দিন গুণছি। বিশ্বাস ঠিক আছে, তবু ভাবছি কবে গল্পটা পিয়ন ফেরত দিয়ে যায়।

মাসের মাঝামাঝি গল্প দিয়েছি—পরের মাসের কাগজে অবশ্যই বার হবে না। তবু ভাবছি, *বিচিত্রা* বার হলেই দেখতে হবে।

একদিন সকালে ভাবছি, কলেজ যাবো কি যাবো না। একজন ভদ্রলোক বাড়িতে এলেন।

তিনি *বিচিত্রার* সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে শত মতবিরোধ সত্ত্বেও যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমায় স্নেহ করেছেন, বন্ধু হয়ে থেকেছেন।

আমি অবশ্য চিনতাম না। নিজেই পরিচয় দিলেন। এবং আমার 'অতসী মামী' গল্পের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে দাবী জানালেন, আর একটি গল্প চাই।

তারপর সব ওলোট পালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে? হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। কেরানীর বেশি খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোটখাটো লেখকও লেখক হতে পারেননি। হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে,

না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস। এ সাধনার সূত্রপাত কিভাবে হয় অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে। আজ সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রথম লেখা' লিখবার কাহিনীতে তার একটি নমুনা পাবেন।

এখনো আত্মীয়স্বজন আপসোস করেন, 'তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দুহাজার টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি বলতো, মানিক?—না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি—'

আপনারা কি বলেন?

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে চলেন। মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ওই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য, —দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে!

জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

দান করি বলা ঠিক নয়—পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে —আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনোদিন পেতো না। কিন্তু এই কারণে লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপসোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো!

সাহিত্য করার আগে

সাহিত্যজীবন আরম্ভ করার একটা গল্প আমি এখানে ওখানে বলেছি। ছাত্র জীবনে বিজ্ঞান শিখতে শিখতে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে 'অতসী মামী' গল্পটি লিখে বিচিত্রায় ছাপানো এবং হঠাৎ এইভাবে সাহিত্য জীবন শুরু করে দেবার গল্প। কিন্তু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় এই: কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কি একজন লেখকের সাহিত্য জীবন শুরু হয়ে যেতে পারে?

আমি বলবো, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে আসতেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।

প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কিভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবন যাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।

সাহিত্য জীবন আরম্ভ হওয়ার পর সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ব বর্জন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিজের অতীত জীবন বিশ্লেষণ করলে প্রস্তুতিটা কিভাবে ঘটেছিল তা কমবেশি জানা প্রত্যেক লেখকের পক্ষে সম্ভব।

সাহিত্য করার আগে কয়েকটা বিষয়ে সকল হবু লেখকের মিল থাকে। যেমন, সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ, জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব খোঁজার তাগিদ, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনকে বাস্তব জীবনে খুঁজে নেবার চেষ্টা, নতুন অভিজ্ঞতাকে চিন্তা জগতে সাহিত্যের টেকনিকে ঢেলে সাজা, ইত্যাদি—এ সমস্তই সাহিত্য জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা ঘটাবার কারণ স্বরূপ হয়। দশজনের চেয়ে সাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর

গভীরভাবে নেওয়ার ফলে চিন্তা ও ভাব জগতে সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চিত হয়ে চলে, তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিজের বাস্তব জীবনের সংঘাত ও পরিবেশের প্রভাব, আয়ত্ত করা জ্ঞানের প্রভাব আর সংস্কারের প্রভাব। মোটামুটি এইভাবেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্যের জোরালো প্রভাব ছাড়া সাহিত্যের জন্ম হয় না।

হাতে কলমে না লিখেও জগতে এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে যেন লেখা মক্‌স করার কাজটাই চলে, চিন্তাকে খানিকটা সাহিত্যের টেকনিকে সাজাবার অভ্যাস জন্মে যায়।

একটা কঠিন ও জটিল বিষয়কে আমি শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম। লেখক তৈরি হবার প্রক্রিয়াটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার আমি যে আসল কথায় আসছি সেটা স্পষ্ট করার জন্য এইটুকু বলা দরকার ছিল।

সাহিত্যিক হতে হলে বাস্তব জীবনের মতো সাহিত্যকেও অবলম্বন করতে হয়। সাহিত্য না ঘেঁটে, নিজের জানা জীবন সাহিত্যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে নিজে যাচাই করে না জেনে এবং প্রতিফলনের কায়দা-কানুন আয়ত্ত না করে সাহিত্যিক হওয়া যায় কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে!

জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।

সমাজজীবনে কি আছে কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে— সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।

লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।

আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানী করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।

সে তো বটেই। মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।

মার্কসবাদই আবার আমাকে এটাও শিখিয়েছে যে, এজন্য আপসোস করলেও নিজেকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।

সদিচ্ছা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, জীবন ও সাহিত্য থেকেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলাম, কিন্তু মার্কসবাদ না জানায় কিছুই করতে পারিনি—এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মার্কসবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ। নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা ঘোষণা করার অধিকার আমি পাইনি। জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি—আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাবো?

প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদ ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করেছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে? তখন ওপরের ওই সূত্র ধরেই আমি অকারণ আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাই, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার লেখার মূল্য কতটুকু এবং কিসে তা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কথাটা বুঝে দেখুন। সূত্রটা কি? বাংলা সাহিত্যে আমি যেটুকু দিয়েছি সেটুকু বাতিল করার প্রশ্নে আমি ভাবছি বাংলা সাহিত্যকে উড়িয়ে দিতে

চাওয়ার স্পর্ধার কথা। এ যেন বিনয়ের ছলে আমার আরেকটা স্পর্ধা প্রকাশ যে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বলতে আমার দানকেও বোঝায়!

কথাটা আমারও মনে হয়েছে বৈকি। কারণ, এটাই তো আসল কথা। বিচার করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নই তাই দাঁড়িয়েছে: আমি নিজের প্রয়োজনে অথবা বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্য করতে নেমেছিলাম? সাহিত্য করার তাগিদ আমার কিভাবে আর কেন এসেছিল? সাহিত্যের আদর্শ জানা ছিল না, সমাজ জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতাম না— তবু, জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিশ্চয়ই ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি কি আমায় সন্ধান দিয়েছিল কিছু নতুন বক্তব্যের—বাংলা সাহিত্যে যা বলা হয়নি?

নেহাত শখের খাতিরে, নাম করা লেখক হবার লোভে সাহিত্য করতে নামিনি সেটা বলাই বাহুল্য। এটুকু সম্বল করে নামলে সাহিত্যিকের বেশি দিন হালে পানি পাবার সাধ্য থাকে না।

ছাত্র বয়সে আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েক বছর আগে 'কল্লোল যুগ' আরম্ভ হয়েছে।

আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু-বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।

স্কুলজীবনেই অনেক নভেল পড়েছি। বোধ হয় ফোর্থ ক্লাস কিম্বা থার্ড ক্লাস থেকে *মানসী ও মর্মবাণী*, *ভারতবর্ষ* এবং *প্রবাসী* প্রায় নিয়মিত পড়তাম। *ভারতবর্ষ* এবং *প্রবাসী*ই তখন প্রধানত ছিল বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র।

ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্রজীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলতো। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গ রূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেতো। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করতো—জিজ্ঞাসা জাগতো, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মতো সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাতো নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।

স্কুল জীবনেই কয়েকবার 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক শ্রীকান্তের অ্যাডভেঞ্চার আমায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়নি। আমিও ভয়ানক দুরন্ত আর দুঃসাহসী ছিলাম, অনেক অ্যাডভেঞ্চারের চিহ্ন সর্বাঙ্গে আছে। বইখানার নরনারীর চরিত্র আর সম্পর্ক আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অভিভূত করেছিল কিন্তু আমি ছেড়ে কথা কইনি—আমার একটা বড় জিজ্ঞাসার জবাব আদায় করে ছেড়েছিলাম। পরে শরৎবাবুর *চরিত্রহীনে*ও যার সমর্থন পেয়েছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তবের প্রেম নিয়ে সাহিত্যের ছাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্ত জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়তো।

রাজলক্ষ্মীকে দেখলাম, মধ্যবিত্ত সংসারের সেবাময়ী স্নেহময়ী রসময়ী নারীত্বের প্রতিমূর্তি, শুধু সংসারের নিয়ম-নীতি বাধা নিষেধ পরাধীনতার কবল থেকে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়িকাকে গৃহের সংকীর্ণতা আর বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন পরিবেশে আনার জন্যই যে তাদের প্রেমের নতুনত্ব, আসলে এও সাহিত্যেরই ওই ছাঁকা অবাস্তব প্রেম-দেহ নিয়ে ওরা বিব্রত হয়ে না পড়লে, দেহকে এত সমারোহের সঙ্গে বাতিল করা না হলে, ওই বয়সে কথাটা খানিক আঁচ করাও হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। মনটা খুঁত খুঁত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো,